সৃষ্টি করতে পারে নি।

৪৪.৫ ভারতে মানবাধিকার সংরক্ষণ (Protection of Human Rights in India)

মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র (UDHR–Universal Declaration of Human Rights)-য়ে প্রথম দিককার স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ভারত অন্যতম। এ ছাড়া ভারতের সংবিধানে জনসাধারণকে ব্যাপকতর পরিধির বিবিধ মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বে ভারতে মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি সাধনের উদ্যোগ-আয়োজন অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের ঘটনা। মানবাধিকারের ধারণা এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত আন্দোলনের সূতিকাগার হল পশ্চিমী সমাজব্যবস্থা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমী দুনিয়ায় সংঘটিত আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লবের মৌলিক দর্শন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ভারতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ও রাজনীতিক আন্দোলন এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মানবাধিকার নিয়ে আলোচনার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। সমকালীন ভারতে মানবাধিকারের দাবি সম্পর্কিত বক্তব্য ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের ও শ্রেণীর মানুষ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সমাজ সংস্কারক ও উদারনীতিবাদী রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ। তাঁরা নাগরিক হিসাবে ভারতীয়দের সাম্যের অধিকারের বিষয়টিকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তুলে ধরেছেন। তা ছাড়া ভূস্বামী শ্রেণীর আর্থনীতিক স্বার্থ সংরক্ষণের উপরও তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। নারী জাতি ও সমাজের নিম্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গের মর্যাদা ও স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে সমাজ সংস্কারকরা সাবেকি সামাজিক প্রথা ও প্রচলিত ঐতিহ্যবাদী ব্যবস্থাদির সংস্কার সাধনের ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। উদারনীতিক চিন্তাবিদ্‌রা ব্যক্তি-মানুষের বাক্য ও মতামতপ্রকাশের এবং সংঘ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমানাধিকারের স্বীকৃতির উপরও উদারনীতিকরা জোর দিয়েছেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়েছে। বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ভারতের মানুষ দীর্ঘমেয়াদী স্বাধীনতা সংগ্রামের সামিল হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে ভারতীয়রা মানবাধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করেছে। মানবাধিকারের আন্দোলনেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বাধীনতার অধিকার। স্বাধীনতার অধিকার আদায়ই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ভিত্তি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে ভারতীয়রা গণপরিষদের মাধ্যমে নিজেদের সংবিধান প্রণয়নের সুযোগ পায়। কোন রকম বৈষম্য ব্যতিরেকে দেশের সকলের জন্য মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ সংবিধানে স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারসমূহ এবং চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে এবং জাতি, ধর্ম, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবাধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে মানুষের অধিকারগুলিকে চিহ্নিত করে তা আদায়ের ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করা হয়। ১৮৯৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মানবাধিকারের একটি রূপরেখা প্রণয়নের চেষ্টা করে। ১৯১৮ সালে কংগ্রেস অধিকারসমূহের একটি ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করে। এই ঘোষণাপত্রটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশও করা হয়। এই ঘোষণাপত্রে বাক্য ও মতামত প্রকাশের, সমবেত হওয়ার, আইনানুসারে বিচার পাওয়ার এবং সর্বোপরি জাতিগত বৈষম্য থেকে স্বাধীনতার অধিকারের কথা ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এসব মানেনি। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসের নির্দেশক্রমে ১৯২৮ সালে মতিলাল নেহরুর প্রতিবেদনে অধিকারসমূহের একটি আনুষ্ঠানিক নথি পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের অধিকারের দাবি এ বারও প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেসে মৌলিক অধিকারসমূহের উপর ভারতের জাতীয় কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৩৬ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রথম পৌর-স্বাধীনতাসমূহের সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি

করে 'ইণ্ডিয়ান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়ন' (ICLU–Indian Civil Liberties Union) গঠিত হয়। ১৯৪৫ সালে তেজবাহাদুর শপ্রু (Taj Bahadur Sapru) মৌলিক অধিকারের গুরুত্বের কথা বলে একটি শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে ভারতীয়রা ভালভাবেই অনুধাবন করে যে, ক্ষুধার জ্বালায় যারা কাতর, তাদের কাছে রাজনীতিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিতান্তই অর্থহীন। কারণ মুষ্টিমেয় সম্পদশালী মানুষের কাছে তাদের স্বাধীনতা বিকিয়ে যাবে।

১৯৪৮ সালের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্বজনীন ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ মানবাধিকারকে ভারতীয় গণপরিষদ ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে। প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতি এবং সংবিধানের অন্যান্য অংশে মূল মানবাধিকারসমূহকে স্বীকার করা হয়েছে। ভারতে এক সামাজিক বিপ্লবকে সম্ভব করে তোলার জন্য সংবিধানকাররা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সংবিধান বিশেষজ্ঞ গ্রাণভিল অস্টিন (Granville Austin) তাঁর *The Indian Constitution : Conerstone of a nation* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : ''Through this revolution would be fulfilled the basic needs of the common man, and it was hoped, this revolution would bring about fundamental changes in the structure of Indian society.''

১৯৯৩ সালে ভারত সরকারের 'মানবাধিকার রক্ষা আইন' (Protection of Human Rights Act)-এ মানবাধিকারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তদনুসারে 'মানবাধিকার হল শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত বা আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারপত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতের বিচারালয় কর্তৃক বলবৎযোগ্য ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, সাম্য ও মর্যাদা সম্পর্কিত অধিকারসমূহ। এ ক্ষেত্রে দুটি অঙ্গীকার পত্রের কথা বলা হয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় গৃহীত (১) 'পৌর ও রাজনীতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারপত্র' এবং (২) 'আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারপত্র'। বস্তুত মানবাধিকার হল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন প্রভৃতি নির্বিশেষে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক পৌর, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক অধিকারসমূহ। মানবাধিকারের উদাহরণ হিসাবে কতকগুলি অধিকারের কথা বলা যায়। এই সব অধিকারগুলি হল: ব্যক্তি-মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সাম্যের অধিকার, নির্বিচার গ্রেপ্তার ও আটকের হাত থেকে অব্যাহতির অধিকার, ন্যায়বিচারের অধিকার, দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির স্বাধীনতা, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, কর্মের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ভোটাধিকার, সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সাংস্কৃতিক বিষয়াদিতে অংশগ্রহণের অধিকার প্রভৃতি।

মানবাধিকার সকলের জন্য সমান। এ ক্ষেত্রে কোনো রকম অসাম্য-বৈষম্য বা পার্থক্য নেই। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সকল সমাজ ব্যবস্থাতেই মানবাধিকারের বিষয়টি প্রচারিত হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছে। 'সকল মানবজাতিই সমান'—এই নীতিটির অস্তিত্ব সকল সভ্যতা-সংস্কৃতি, দর্শন ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে পাওয়া যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও মানবিক মর্যাদা লঙ্ঘন ও বিভিন্ন যুক্তিতে ব্যক্তিবর্গের অধিকার সমূহের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এবং এ সবের পিছনে রাষ্ট্র ও সমাজ বিভিন্ন সমর্থক সূচক যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে। মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক তার অস্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বিধিবদ্ধ অধিকারের মতবাদের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, অধিকারসমূহের সুরক্ষার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অপরিহার্য এবং সংবিধানের মাধ্যমে অধিকারসমূহ সংরক্ষিত হওয়া দরকার।

আইনি অধিকারসমূহের অস্তিত্ব সত্ত্বেও কোনো কোনো দেশের সরকার মানব জীবনের ঘোষিত মর্যাদা ও সমানাধিকারকে আড়াল করে পীড়নমূলক শাসন কায়েম করে। এই বিষয়টি ভাবনার সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে এই ধারণাই জোরদার হয় যে, সাধারণ মানুষের অধিকারসমূহ সংরক্ষণের ব্যাপারে শুধুমাত্র সরকারের উপর আস্থা রাখা যায় না। এ রকম পরিস্থিতিতে এই ধারণা প্রবলভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, এই সমস্ত অধিকারের নিরাপত্তার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ধরনের সংরক্ষণ আবশ্যক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানবাধিকারসমূহের আন্তর্জাতিক করণের ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন ও চাপের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধপূর্ব এবং যুদ্ধকালীন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমষ্টিবাদী ও কর্তৃত্বমূলক সরকারসমূহ নিজেদের দেশে এবং তাদের অধিকৃত অঞ্চল সমূহে অবাধে এবং ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। বংশ, জাতি ও ধর্মীয় কারণে অনেক ক্ষেত্রেই সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। যুদ্ধের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণা ব্যাপকভাবে দৃঢ়মূল হয় যে, বিশ্বশান্তি ও প্রগতির স্বার্থে মানবাধিকারসমূহের সক্রিয় আন্তর্জাতিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা একান্তভাবে অপরিহার্য। পরবর্তীকালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে এই ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে।

ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত মানবাধিকারসমূহের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। প্রস্তাবনায় সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে; মর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্যের কথা বলা হয়েছে; এবং সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারের পরিচিতি দিয়ে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে নির্দেশমূলক নীতি হিসাবে মানবাধিকারসমূহের একটি বিস্তারিত তালিকা সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ছ'প্রকারের মৌলিক অধিকার সন্নিবিষ্ট আছে। এ গুলি হল : এক, সাম্যের অধিকার (১৪-১৮ ধারা); দুই, স্বাধীনতার অধিকার (১৯-২২ ধারা); তিন, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (২৩ ও ২৪ ধারা); চার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (২৫-২৮ ধারা); পাঁচ, সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (২৯ ও ৩০ ধারা) এবং ছয়, শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (৩২-৩৫ ধারা)।

মানবাধিকারের সুরক্ষা // ভারতে মানবাধিকারের সুরক্ষার ব্যাপারে বিবিধ উপায়-পদ্ধতি বর্তমান। সংশ্লিষ্ট উপায়-পদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এক : ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। স্বভাবতই মানবাধিকার ও স্বাধীনতার ব্যাপারে ভারতের বিশেষ দায়বদ্ধতা অস্বীকার করা যায় না। ভারতের সংবিধান ও রাজনীতিক ব্যবস্থার একটি বড় বিষয় হল মানবাধিকারসমূহ এবং মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ। এছাড়া ভারতের সমাজব্যবস্থা হল বহুত্ববাদী। ভারতে আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, ভাষা-সংস্কৃতি ও জীবনধারাগত ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈচিত্র্য বর্তমান। এ রকম এক পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের কারণে সকলের জন্য মানবাধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ সংরক্ষণের ব্যাপারে বাড়তি সতর্কতা ও সক্রিয়তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াসমূহের অস্তিত্ব ভারতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয়। ভারতের মত বহুত্ববাদী সমাজে অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি বিশেষ মাত্রাযুক্ত।

দুই : ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। ভারতের গণতান্ত্রিক সংবিধানে সাধারণতান্ত্রিক ও সংসদীয় সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তা ছাড়া রাজনীতিক অধিকারসমূহ ভোগের বিধি-ব্যবস্থা সংবিধানে সংযুক্ত আছে। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিপন্ন হয় যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের ভোগকে সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ।

তিন : ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থার একটি বড় বৈশিষ্ট্য বা অপরিহার্য অংশ হল কোন রকম বৈষম্য ব্যতিরেকে ভারতের জনসাধারণের সামগ্রিক উন্নয়নের অধিকার। দেশের মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকার, সংরক্ষণ, সমর্থন ও সুরক্ষার ব্যাপারে ভারত তার প্রতিশ্রুতিকে অপ্রকাশিত রাখেনি।

চার : জনসাধারণের অধিকার ভোগের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করার জন্য স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সহায়ক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : আইনের অনুশাসন, বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা, শাসনবিভাগ থেকে বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রভৃতি। জনসাধারণের অধিকারসমূহের সুরক্ষার সহায়ক অন্যান্য বিষয়াদি হিসাবে আরো কিছু সাংবিধানিক ব্যবস্থা বর্তমান। এ গুলি হল : দরিদ্রদের জন্য নিখরচায় আইনি সাহায্যে প্রদানের ব্যবস্থা, জনস্বার্থবিষয়ক মামলার ব্যবস্থা, দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির জন্য আদালত প্রভৃতি। অধুনা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নারী, শিশু, সমাজের দুর্বল শ্রেণীসমূহ এবং তপসিলী জাতি ও তপসিলী উপজাতিসমূহের বিশেষ সুরক্ষার ব্যাপারে সংবিধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, সংখ্যালঘুদের অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতি সংবিধানে স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লঙ্ঘিত মৌলিক অধিকারের বিচার বিভাগীয় সংরক্ষণের এবং সুবিচার পাওয়ার অধিকারকে সংবিধানে স্বীকার করা হয়েছে। মৌলিক অধিকার বিরোধী আইন বা শাসন বিভাগীয় নির্দেশকে বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ : সকল মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের ব্যাপারে ভারত কঠোরভাবে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেছে। উন্নয়নের অধিকারকে অন্যতম মূল মানবাধিকার হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে দারিদ্র্য, অনটন, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, রোগ-অসুখ প্রভৃতির বিরুদ্ধে অধিকারের কথা বলা যায়। দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষার বিস্তার, সকলকে আলোকিতকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষের উন্নয়নের সকল দিক এর অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা, কল্যাণ, উন্নত জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি সব কিছুই মানুষের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে নিশ্চিত করার ব্যাপারে সচেতন উদ্যোগই হল এর মূল কথা। অবশ্য এর সঙ্গে উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধার সমতার বিষয়টিও সংযুক্ত। উদারনীতিকরণ, বেসরকারীকরণ, উন্মুক্ত বাজার ও স্বাধীন

প্রতিযোগিতা, বিশ্বায়ন প্রভৃতি প্রক্রিয়া অবলম্বনের মাধ্যমে ভারত দ্রুত আর্থনীতিক উন্নয়নের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। ভারত তার উন্নয়নশীল অর্থনীতিকে উন্নত অর্থনীতিতে পরিণত করার ব্যাপারে সক্রিয়।

৪৪.৬ মানবাধিকারের সুরক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ (Hindrances to the Protection of Human Rights)

ভারতে মানবাধিকারের সংরক্ষণেব বিষয়টি সহজ-সরল বা সাবলীলভাবে সম্পাদিত হয়নি। মানবাধিকারের সুরক্ষার পথে বিবিধ প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।

এক : স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের নিয়ম-নিষেধ আরোপের উদ্দেশ্যে বারে বারে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। ভারতে প্রথম সংবিধান সংশোধনী পাস হয় ১৯৫১ সালে। এই প্রথম সংবিধান সংশোধনী আইন থেকে গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে চতুর্থ, ষোড়শ, সপ্তদশ, চব্বিশতম, বিয়াল্লিশতম, চুয়াল্লিশতম এবং ঊনষাটতম সংবিধান সংশোধনী আইন উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জরুরী অবস্থার ঘোষণা বহাল থাকাকালীন সময়ে সংবিধানের ৩৫৮ ও ৩৫৯ ধারার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হতে পারে। তা ছাড়া সংবিধানের ৩৫২ ও ৩৫৬ ধারার মাধ্যমে জাতীয় জরুরী অবস্থা এবং রাজ্যভিত্তিক জরুরী অবস্থা জারী করা হলে গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ নিয়ন্ত্রিত হওয়ার আশংকা থাকে।

সমালোচকরা এবং মানবাধিকারের ক্রিয়াকারীরা এ ক্ষেত্রে সরকারী নীতির বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তাঁদের অভিমত অনুসারে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহের উপর মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়েছে। ঐ রকম পরিস্থিতিতে জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ সংরক্ষণের ব্যাপারে বিচার বিভাগও সম্যকভাবে সন্তোষজনক ভূমিকা পালন করতে পারে নি।

দুই : ভারতে মানবাধিকার সুরক্ষার পথে বিবিধ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বর্তমান। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অধিকতর দুর্ভাগ্যজনক। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা বর্তমান। এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা মানবাধিকার ও মানুষের স্বাধীনতাসমূহের সুরক্ষার পথে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা বর্ণ ও জাতপাতের ভিত্তিতে ক্রমস্তর বিন্যস্ত। ভারতের জাতিগোষ্ঠীগুলিকে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ এই দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। উচ্চবর্ণের জাতিসমূহ নিম্নবর্গের জাতিসমূহের উপর বিবিধ অসামর্থ্য আরোপ করে; নিম্নবর্ণের জাতিসমূহের উপর শোষণ-পীড়ন কায়েম করে। নিম্নবর্গের জাতিগোষ্ঠীগুলি কখনো বিক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহী হয়। উচ্চবর্ণের জনগোষ্ঠীসমূহ প্রতিহিংসামূলক নির্যাতন চালাতে দ্বিধা করে না। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হরিজন নিগ্রহের ঘটনা এখনো ঘটে। আদিবাসীদের উপর অমানবিক আচরণের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রায়শই কমবেশী পাওয়া যায়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের মর্মান্তিক অনেক ঘটনাই ঘটে। এইভাবে যে রেষারেষির সৃষ্টি হয় তার প্রতিকূল প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সকল জাতিগোষ্ঠীর উপর পড়ে।

ভারতে উপরিউক্ত সামাজিক সমস্যাদি অধিকতর প্রকট হয়ে পড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী-সমূহের অস্তিত্বের কারণে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ভারতে বর্তমান। অনেক সময় সাধারণভাবে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। আবার বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্ক অনেক সময় জনজীবনে সংকটের সৃষ্টি করে। এ ধরনের উত্তেজনা ও বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্কের কারণে সকলের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে।

ভারতে শিশু শ্রমিকের সমস্যা অবিদিত নয়। দারিদ্র্যের জ্বালায় পীড়িত পিতামাতা কিশোর-কিশোরীদের কলকারখানার কাজে এমন কি পীড়নমূলক দুরূহ কাজেও লাগিয়ে দেয়। ছেলেমেয়েদের অধিকার রক্ষায় বিষয়টি অবহেলিত হয়। এর মূল কারণ হিসাবে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, অনগ্রসরতা প্রভৃতির কথা বলা হয়।

ভারতের নারীজাতিকেও শোষণ-পীড়নের শিকার হতে হয়। নারীনির্যাতনের মূল কারণ ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত আছে। এ ক্ষেত্রে পণপ্রথার সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পণপ্রথার কারণে কণ্যাভ্রূণ হত্যা, শিশুকন্যা হত্যা, বধূহত্যা প্রভৃতি অমানবিক ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়।

আবার আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের উপরও পীড়নমূলক ঘটনা ঘটে। ভারতে

মানবাধিকার সুরক্ষার পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে শিশুশ্রমিক, নারীনির্যাতন, দাসত্বাবদ্ধ শ্রমিক, শোষণ-পীড়ন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিন: মানবাধিকারের সুরক্ষায় পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে জনযুদ্ধ গোষ্ঠীসমূহ, বৈপ্লবিক গোষ্ঠীসমূহ, সন্ত্রাসবাদ, সংঘাত-সংঘর্ষ প্রভৃতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী ও জঙ্গীগোষ্ঠী ভারতের বিভিন্ন অংশে সক্রিয়। এই সমস্ত গোষ্ঠী সাধারণ মানুষের উপর জঙ্গী কায়দায় শক্তি প্রয়োগ করছে। তাদের হিংসাশ্রয়ী কাজকর্মের কারণে সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়ছে। জঙ্গী গোষ্ঠীগুলি সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপকেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে অনুসরণ করে। এই সমস্ত জঙ্গী ও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপের কারণে জনসাধারণের মানবাধিকার নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘিত হয়। মানুষের জীবন ও স্বাধীনতার জন্য সন্ত্রাসবাদী জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির সচেতনতা বড় একটা দেখা যায় না। এই গোষ্ঠীগুলি নিজেদের মানবাধিকারের সপক্ষে সোচ্চার হয়, অথচ জনসাধারণের মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে দ্বিধাবোধ করে না। সাফল্যের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে সরকারী হাতিয়ারসমূহের সীমাবদ্ধতা অনেক সময়েই প্রকট হয়ে পড়ে।

চার: সরকারী পীড়নমূলক হাতিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধিও মানবাধিকারের বিরোধী। এ বিষয়ে মানবাধিকারের ক্রিয়াকারীরা এবং মানবাধিকারমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ মাঝে মাঝেই প্রতিবাদে মুখর হয়। সরকারের বিভিন্ন আধা-সামরিক বাহিনী আছে। এই সমস্ত বাহিনীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এ রকম বাহিনীর উদাহরণ হিসাবে কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী (CRPF—Central Reserve Police Force), সীমান্ত নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী (BSF—Border Security Force), 'শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী' (CIMF) প্রভৃতির কথা বলা যায়। এই সমস্ত আধা-সামরিক বাহিনীর কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বধানে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে অবস্থান করে। এই সমস্ত বাহিনীকে অনেক সময় অবাঞ্ছিতভাবে ব্যবহার করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্যসরকারগুলি ক্ষেত্রবিশেষে গণ-বিক্ষোভ, অস্থিরতা, সংঘাত-সংঘর্ষ মোকাবিলা করার জন্য এই সমস্ত আধা-সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে। সরকারী বক্তব্য অনুসারে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণের জন্য এই সমস্ত বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই বাহিনীগুলি শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটে। তারফলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়।

পাঁচ: পীড়নমূলক আইনপ্রণয়নও ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম মৌলিক কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়। মানবাধিকারের ক্রিয়াকারীরা এবং বিদ্যমান ব্যবস্থার সমালোচকরা মনে করেন যে, ভারতে পীড়নমূলক আইন প্রণয়নের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা বর্তমান। যে কোন কারণেই হোক না কেন সরকারী কর্তৃপক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে, এমন কি জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারের মত মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে আইন প্রণয়ন করে। ভারতে প্রণীত এ রকম আইন বহু ও বিভিন্ন এবং এ রকম আইনের সংখ্যাও কম নয়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হল: 'নিবর্তনমূলক আটক আইন' (PDA—Preventive Detention Act, 1950); 'আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন', (MISA—Maintenance of Internal Security Act, 1971); 'ভারত রক্ষা আইন' (DIA—Defence of India Act, 1962); 'জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা আইন', (NSA—National Security Act, 1980); 'অত্যাবশ্যক সংস্থাসমূহে কাজকর্ম চালু রাখা আইন' (ESMA—Essential Services Maintenance Act, 1981); 'বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ এবং চোরা চালান ও মজুতদারী প্রতিরোধ আইন' (COFEPOSA—Conservation of Foreign Exchange and Prevantion of Smuggling Activities, 1971); 'সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ আইন' (POTA—Prevention of Terroism Act, 2002) প্রভৃতি।

বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যেও এ রকম কিছু পীড়নমূলক আইন প্রণীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে কতকগুলি বিশেষগুলি উল্লেখযোগ্য: পশ্চিমবঙ্গ হিংস্র কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (West Bengal Prevention of Violant Activities Act, 1970); বিহার জনশৃঙ্খলা রক্ষা আইন (Bihar Maintenance of Public Order Act, 1949); অসম উপদ্রুত অঞ্চল আইন (Assam Disturbed Area Act, 1955); অসম ও মণিপুর সামরিক বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন [Armed Forces Special Powers (Assam and Manipar) Act, 1958]; উত্তরপ্রদেশ দুর্বৃত্ত ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ আইন (The UP Gangsters and Anti-social Activities Act, 1986); পঞ্জাব রাজ্য নিরাপত্তা আইন (Punjab Security of State Act, 1949) প্রভৃতি। প্রকৃত প্রস্তাবে সকল অঙ্গরাজ্যেই অল্পবিস্তর এ রকম আইন আছে।

ছয়: পুলিশ ও আমলাদের বাড়াবাড়ি ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। দুষ্কৃতিদের দমন করে আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণের দায়িত্ব পুলিশ ও প্রশাসনের। অথচ পরিতাপের বিষয় হল যে, প্রশাসনের পদস্থ আমলা এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা অনেক সময় মানবাধিকারের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটে। আমলা, পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী কখনো কখনো দুর্নীতিমূলক ও নিষ্ঠুর আচরণ করে। ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রশাসনিক ইতিহাসে আমলা ও পুলিশের দুর্নীতিমূলক এবং

পীড়নমূলক ভূমিকার নজিরের অভাব নেই। এ সব থেকে ভারতে মানবাধিকারের অবস্থার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা দুঃখ ও হতাশার সৃষ্টি করে। সমালোচকদের মধ্যে অনেকে মানবাধিকারের এই অবস্থাকে জঘন্য বলেন। অনেকে আবার এই অবস্থাকে ভয়ঙ্কর বলার পক্ষপাতী। ভারতে মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মোকাবিলা করার ব্যাপারে সরকারী ব্যর্থতার প্রতি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই সমস্ত সংস্থার উদাহরণ হিসাবে অ্যাম্‌নেসটি ইন্টারন্যাশনাল, ইউরোপীয় মানবাধিকার কমিশন, ভারতের এ. পি. ডি. আর. প্রভৃতি সংস্থার কথ বলা যায়। পুলিশ-হেপাজতে আটক ব্যক্তির মৃত্যু; নানা ধরনের পুলিশী নির্যাতন; বে-আইনী গ্রেপ্তার ও আটক; প্রশাসনিক বাড়াবাড়ির ঘটনা প্রভৃতি খবরা-খবর প্রায়শই প্রাত্যহিক সংবাদপত্রে পরিলক্ষিত হয়। মানবাধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা মানবাধিকার বিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিবাদী আন্দোলন সংঘটিত করেছে; সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন কোন সাফল্য পাওয়া যায়নি। আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাজকর্মের মাধ্যমে অনেক সময় সর্বসাধারণের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।

(Human Rights Movements)